মীলাদুন্নবী (সা.) মাহ্‌ফিলের গুরুত্ব

শায়খুল হাদীস আল্লামা মোঃ হবিবুর রহমান

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে মাহফিলের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ আলোচনা করা যায়। সময়ের স্বল্পতা হেতু খুবই সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা উপস্থাপন করছি।

সহীহ বোখারী শরীফের কিতাবুল ঈমানে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়, সাহাবাগণ কয়েক জন একত্রিত হলে গুরুত্বের সাথে একটি আমল করতেন। আমলটি হলো কুরআন শরীফ শিক্ষা অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে যিনি ইল্‌মে কুরআনে বেশি পারদর্শী, তাঁর থেকে হুকুম আহকাম সম্পর্কে অবহিত হতেন। আর নবীজির নূরানী জিন্দেগীর নানা ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে তাঁরা এ আমল করতেন নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণ এবং সজীব করার জন্য।

সাহাবাগণের আমল থেকে বুঝা গেলো ইল্‌মে কুরআনের শিক্ষা যেমন ঈমানকে পরিপূর্ণ করে, ঠিক তেমনি নবীজির আলোচনা দ্বারাও ঈমান পরিপূর্ণ ও সজীব-সতেজ হয়। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহ্‌ফিলে যেহেতু হুজুর পাকের মোবারক জিন্দেগীর বিভিন্ন ঘটনা বিশেষ করে জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়, তাই এ ধরনের মাহ্‌ফিল অত্যন্ত গুরুত্ববহ। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় একদা বাদ মাগরীব হুজরে পাক সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম এক জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু আন্‌হুর ঘরে তাশরীফ নিলেন। জাবির রাদ্বিআল্লাহু আন্‌হু তখন তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে আলোচনারত ছিলেন। হুজুরে পাকের আগমনে জাবির (রা.) আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। নবীজী ফরমালেন-জাবির, তোমরা আলোচনা চালিয়ে যাও, আমার প্রয়োজন পরে বলবো। জাবির আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি তাশরীফ এনেছেন; তাই আমার আলোচনার আর প্রয়োজন নেই। মূলতঃ আমি আপনারই আলোচনা করছিলাম। নবীজি জানতে চাইলেন, আমার ব্যাপারে কি আলোচনা করছিলে? জাবির আরজ বললেন- আপনার শুভ জন্মের সময় ঘটে যাওয়া আশ্চর্য ঘটনাবলী আলোচনা করছিলাম। জাবিরের জবাব শুনে ইরশাদ করলেন ঃ وجبت لكم الجنة তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেলো। অন্য বর্ণনায়, তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে গেলো। (আত তানভীর ফি মাওলিদিল্ বাশীরী ওয়ান নাযীর) হাদীস শরীফের এসব বর্ণনা থেকে বুঝা গেলো যে, সাহাবাগণ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের জন্ম-বৃত্তান্ত শুভ জন্মকালীন ঘটনা এবং জিন্দেগীর অন্যান্য আশ্চর্য ঘটনাবলীর আলোচনাকে নিজেদের ঈমানের পূর্ণতা দানকারী বিবেচনা করতেন। স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম যে আমলকে ঈমানের পূর্ণতা দানকারী বিবেচনায় গুরুত্বের সাথে পালন করতেন, তা যে কিয়ামত অবধি উম্মতের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের ঈমানী দুর্বলতা হতে আমলী জিন্দেগীতে চূড়ান্ত অধঃপতনের যুগ চলছে। তাই এ সময়ে মুসলমানদের ঈমানের পূর্ণতা বিধান এবং মৃতপ্রায় ঈমানকে সজীব-সতেজ করার যত পন্থা আছে, সবই প্রয়োগ করতে হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জিন্দেগীর ঘটনাবলী আলোচনা দ্বারা ঈমানে পূর্ণতা আসে, ঈমান সজীব-সতেজ হয়, তাই বিভিন্ন উপলক্ষে এ আলোচনা বেশি পরিমাণে করা উচিত। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের মাহফিলে নবীজির জীবনের নানা ঘটনাবলী বিশেষত: জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা হয়, তাই এ ধরনের মাহফিলের গুরুত্বও খুব বেশি। এখানে একটি কথা উল্লেখের দাবী রাখে যে, বর্তমান সময়ে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাহফিল যে রূপে, যে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে করা হয়, অবিকল রূপ কুরূনে ছালাছায় ছিলো না বলে কেউ কেউ আপত্তি পেশ করেন। অথচ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যুগের চাহিদা বিবেচনায় শরীয়তের মৌলিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীকে যুগোপযোগী করে সাজাতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ছিলো মসজিদ কেন্দ্রিক। এমনকি ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো মসজিদ। ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন হাদীসের জ্ঞান চর্চার জন্য বর্তমান যুগের মতো মাদ্রাসা ছিলো না, ছিলোনা নির্ধারিত সিলেবাস, ছিলো না বর্তমানের মতো শ্রেণী বিন্যাস ইত্যাদি। যুগের চাহিদা বিবেচনায় এই পদ্ধতি কুরূনে ছালাছার অনেক পরে প্রবর্তিত হয়েছে। এই যুগোপযোগী বিন্যাসে যদি কারো আপত্তি না থাকে তবে মীলাদুন্নবী মাহ্‌ফিলের সময়োপযোগী বিন্যাসের ক্ষেত্রে অহেতুক আপত্তি তুলবেন কেন? কুরূনে ছালাছায় পরিচালিত অভিযানে তীর-তলোয়ার ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে ট্যাংক, কামান আর পরমাণবিক বোমার যুগে বিদআত থেকে বাঁচার অজুহাতে যদি কেউ তীর তলোয়ার ব্যবহারের উপদেশ দেন, তবে তাকে অবিবেচক, বোকা বলা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

এবার এক হাদীস শরীফ এবং প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা পেশ করতে চাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে ইরশাদ করলেন, 'এ দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনই আমার উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী জানা গেলো নবীজি আপন জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ সোমবার রোযা রাখতেন।

একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নবীজি আপন জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ নিজে রোযা রাখতেন, উম্মতকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেননি। এর উত্তরে মুহাদ্দিছিনে কেরাম বলেন,- নির্দেশ না দেয়ার প্রধান কারণ হলো উম্মতের প্রতি করুণা প্রদর্শন। এর উদাহরণ পাওয়া যায় তারাবীর জামাত সম্পর্কিত হাদীস শরীফে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে মাত্র তিন বা চার রাত তারাবীর জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেষ রাতে সাহাবায়ে কেরাম বিপুল উৎসাহে মসজিদে সমবেত হয়ে নবীজির অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হোজরার পর্দা সরিয়ে ঘোষণা করলেন তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা আমি বুঝতেছি। তবে আমি আর আসব না, কেননা আমি আশংকা করি, আল্লাহ্পাক বেশি পছন্দ করে নিলে তোমাদের জন্য এ আমল ফরয করে দিতে পারেন। যদি তাই হয়ে যায় তবে বিশ রাকাআত তারাবীর নামায জামাতে আদায় করা তোমাদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে। রাউফ-রহীম নবী সব সময়ই উম্মতের জন্য উদ্গ্রীব থাকতেন। চাইতেন তারা যেনো খুব সহজেই পার পেয়ে যায়।

এ কারণেই রহমতের নবী আপন জন্মের শুকরিয়ায় নিজে রোযা রেখেছেন উম্মতকে নির্দেশ দেননি। নির্দেশ দিলে এ আমলকে আল্লাহ্ ফরয করে দেয়া বিচিত্র ছিলো না। আরো একটি কথা উত্থাপিত হয়- নবীজি আপন জন্মের শুকরিয়ায় যেহেতু কেবল রোযা রেখেছেন, তাই এ উপলক্ষে কেবল রোযাই রাখা যায় মাহ্ফিল বা অন্য কোন আমল করা যায় না। ইমাম ইবনুল হাজ্ব নিজে থেকেই এ কথা উত্থাপন করে জবাবও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রাপ্ত রহমত এবং বিশেষ কোন অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করার জন্য নফল রোযা, নামায, সদকা, আলোচনা সবই করা যায়। আল্লাহ্পাক জগতবাসীকে তাঁর হাবীবের চেয়ে বড় কোন রহমত দান করেননি। সৃষ্টিকূলের প্রতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামই হলেন আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নিয়ামত। তাই এ নিয়ামত প্রাপ্তির দিন অর্থাৎ হুজুরে পাকের শুভ জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ শরীয়ত সম্মত পন্থায় সব ধরনের আমলই করা যায়।

মীলাদুন্নবীর মাহ্ফিল সারা বছরই করা যায়। তবে মাহে রবিউল আউয়ালে বিশেষ গুরুত্বের সাথে করার কারণ হিসেবে মুহাদ্দিছিনে কেরাম আশুরার রোযা সম্পর্কিত হাদীস শরীফকে আলোচনায় আনেন। হিজরতের পর নবীজি লক্ষ্য করলেন মদীনার ইহুদীগণ আশুরার দিনে রোযা রাখে। এ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করলে জানালো যে, এ দিনে আল্লাহ্ তায়ালা মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফিরাউনের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন আর ফিরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। এই দিনের স্মরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য প্রতি বছর এ তারিখ তারা রোযা রাখে। ইহুদীদের জবাব শুনে নবীজি ইরশাদ করেন আমরা তো মুসা (আ.)-এর বেশি হকদার। এ সময় থেকে তিনি আশুরার রোযা রাখতে শুরু করেন এবং সাহাবাগণকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। এ হাদীসের আনুষাঙ্গিক আলোচনায় মুহাদ্দিছিনে কেরাম বলেন, মুসা আলাইহিস সালাম ফিরাউনের কবলমুক্ত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, এই অনুগ্রহের স্মরণে প্রতি বছর আশুরার রোযা রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা হয়। তবে সেদিনটির অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত যেদিন জগতবাসীর প্রতি আল্লাহ্ সবচেয়ে বড় রহমত, সবচেয়ে বড় নিয়ামত প্রদান করলেন। মুহাদ্দিছিনে কেরাম নবীজির শুভ জন্মের দিনকে স্মরণীয় হিসেবে পালন এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার জন্য মাহফিল করা, রোযা রাখা, সদকা খয়রাত করা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মোদ্দাকথা নবীজির শুভ জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ শরীয়ত সম্মতভাবে সব ধরণের নফল আমল করা যায়। হুযুরে পাকের নূরানী জিন্দেগীর ঘটনাবলী বিশেষতঃ জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনার জন্য মাহ্ফিল করা জরুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাহে রবিউল আউয়ালে ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনে কেউ কেউ এই বলে আপত্তি করেন যে, শরীয়তে ঈদ মাত্র দু'টি; তৃতীয় ঈদ পালনের কোন সুযোগ নেই। মূলতঃ এরূপ বলাটা তাদের অজ্ঞতারই প্রকাশ, কেননা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের শুক্রবারকে মুসলমানের ঈদ হিসেবে অবিহিত করেছেন। শরীয়তে দুই ঈদ ছাড়াও আরো ঈদ আছে এবং প্রত্যেক ঈদের আলাদা হুকুম, আহকাম ও করণীয় আছে। এ সম্পর্কিত আলোচনায় ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী (রা.) কত সুন্দরই না বলেছেন- "তাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন-যারা মাহে রবিউল আউয়ালের প্রতিটি রাতকে ঈদ হিসেবে পালন করে। (সংক্ষেপিত)

(বিগত ১২ রবিউল আউয়াল ১৪২৫ হিজরী লন্ডনের সেন্ট হিলডাস ইস্ট কমিউনিটি সেন্টারে ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী মাহ্ফিলে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে)
অনুলেখন ঃ মোঃ আবদুল আউয়াল হেলাল